প্র দী প ব সু

খাদ্যরুচি স্বাদজ্ঞান

১

প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী তাঁর *আমিষ ও নিরামিষ আহার* (১৯০০) বইয়ের শুরুতে বলেছিলেন, বাঙালিদের কোনো বিষয়েই শৃঙ্খলা নেই, পরিপাট্য নেই এবং বাঙালি আহারে এই চরিত্র 'বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়'। তিনি বলেছিলেন : 'আমাদের ভোজে মাছের সঙ্গে ক্ষীরের সঙ্গে যেন একটা হ-য-ব-র-ল ব্যাপার হইয়া ওঠে।' বলেছিলেন এটা একটা বিশৃঙ্খলা, এবং এই বিশৃঙ্খলা থেকে বাঙালিকে উদ্ধার করতেই তাঁর এই বিশাল বই রচনা। তিনি বাঙালি রান্নাকে তা বলে খারাপ মনে করতেন, এমন নয়। তিনি বরং মনে করতেন বাঙালি রান্না অত্যন্ত সুস্বাদু, কিন্তু বাঙালি আহারের কোনো সিস্টেম নেই, এক বিশৃঙ্খল অবস্থা এবং এটাই হল রুচির অভাব। একসঙ্গে হ-য-ব-র-ল যা পারছে তাই খাচ্ছে। এই কারণে তিনি বাঙালি বাড়িতে নিমন্ত্রণে বা ভোজের জন্য মেনু তৈরি করে দিয়েছিলেন, নাম দিয়েছিলেন 'ক্রমণী'। রান্নার বইয়ে ফরাসি আহারের প্রস্তুতপ্রণালী দিয়েছিলেন, যেমন সসের মধ্যে, 'ফ্লাঁ অ জেলে ডে পোয়সঁ', ডিমের মধ্যে 'উফ, অঁসাঁস', এছাড়া ইটালিয়ান, আইরিশ, ইংলিশ, পেশোয়ারি, নানা ধরনের রান্নার পদ দিয়েছেন, যাতে বাঙালি খাদ্যরুচি কসমোপলিটান হয়। তাঁর দেওয়া বিভিন্ন মেনু থেকে একটির উল্লেখ করি : 'ইলিশ মাছের ট্র্যামফ্রাডু, আন্ডা বেকন, ডামপ্লিং, মুরগীর স্টেক, ফুলকপি, কলাইশুঁটি ও আলুসিদ্ধ, চিংড়ি পোলাও, চিংড়ি কারি, মিঠা চাটনি, চিজ মেকেরনি, টিপসি পুডিং, কমলালেবুর জেলী।' বলা প্রয়োজন প্রজ্ঞাসুন্দরীর বই প্রকাশের প্রায় কুড়ি বছর আগে বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় তাঁর *পাক-প্রণালী* (১৮৮৫-১৯০২) বইতে বিভিন্ন 'ভোজ-তালিকা' দিয়েছেন। বিপ্রদাসের বইতেও বাঙালি রান্না ছাড়া

আছে জার্মান পুডিং, পর্তুগিজ ভিন্ডালু, মুলতানি ছোপ্, আলুর বিলাতি পিষ্টক, আইরিশ স্টু প্রভৃতি। মূল উদ্দেশ্য একটাই, বাঙালি খাদ্যরুচিকে সম্প্রসারিত করা, কিছুটা সংস্কার-বর্জিত করা, কসমোপলিটান করা। বিপ্রদাসের দেওয়া মেনুগুলি থেকে একটি উল্লেখ করি : 'বাদশাহী পরোটা, পটলের দোলমা, আমসির সহিত শাকভাজা, মাছের চপ্, মাংসের কাটলেট্, মাস্টার্ড, ইংলিস পোলাও, কই মাছের ফ্রাইকারি, মাছের কালিয়া, মাংসের কোর্ম্মা, দই মাছ, ঝাল্‌দার চাটনি, মুগের ডালের মোহনভোগ, পেস্তার বরফি, সীতাভোগ, রসগোল্লা, জলভরা তালশাঁস, চিনিপাতা দই, সরবৎ, রাবড়ি ফল ইত্যাদি।' আগেকার দিনের বাংলা রান্নার বইয়ে একটা কথা ব্যবহৃত হত—'স্বাদজ্ঞান'। বাংলা ভাষায় রন্ধনচর্চার পথিকৃৎরা বাঙালির স্বাদজ্ঞান প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন, সেই সঙ্গে খাদ্যরুচির পরিমার্জনাও চেয়েছিলেন।

২

ইংরেজি ভাষায় 'টেস্ট' শব্দটির অর্থ রুচি এবং স্বাদ দুই-ই। ইংরেজি ভাষায় তাই রুচি এবং স্বাদ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। আমাদের বাংলা ভাষায় 'স্বাদ' ও 'রুচি' দুটি আলাদা শব্দ, তাই স্বাদকে রুচির বাঁধনে বাঁধতে হয়। বলা বাহুল্য, রুচি নির্মিত হয় সমকালীন সংস্কৃতি, ধ্যান-ধারণাকে নির্ভর করে, রুচি কোনো চিরন্তন মাপকাঠি নয়। তবে কেন কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে রুচি এক বিশেষ রূপ ধারণ করল সেটাও জানা জরুরি। রুচির নেতিবাচক দিক হল এর ব্যবস্থাপত্র অনেক সময় নিষেধকারী, রুচির নির্দেশ বলে 'এটা কোরো না, ওটা কোরো না', কিন্তু বাংলা রান্নার বইয়ের জগতে নিষেধের বদলে বরং এক ধরনের ইনক্লুসিভ স্পিরিট আছে। নানা দেশের নানা রকমের রান্না দিলাম, সব রকম পদই চেখে দেখো। এই প্রয়াস আরও গুরুত্বপূর্ণ ও কৃতিত্বের দাবি রাখে এইজন্য যে বাঙালি হিন্দুর, অন্তত সেসময়ে, খাদ্যাভাস নিয়ন্ত্রিত হত ধর্মীয় নিয়মবিধির মাধ্যমে, সেখানে এই ধরনের প্রচেষ্টা ধর্মীয় নিগড় থেকে নিষ্ক্রমণের কথাই বলে।

খাদ্যরুচির কথা বললেই, শ্রেণি-বিভাজনের প্রসঙ্গ আসবেই। শ্রেণির সঙ্গে রুচির, খাদ্যাভাসের একটা সম্পর্ক আছে। অন্যভাবে বলতে পারি, খাদ্যরুচির সঙ্গে প্রত্যেকটি শ্রেণি, শরীর সম্পর্কে কী ভাবে, শরীরের শক্তি, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের উপর খাদ্যের প্রভাব সম্পর্কে কী ভাবে, তার সম্পর্ক আছে। একটি শ্রেণি হয়তো তাদের পুরুষের শক্তি, বল, এইসবকে গুরুত্ব দেয়, অন্য শ্রেণি শারীরিক সৌন্দর্য, মেদহীনতার কথা ভাবে। খাদ্যরুচি তাই একভাবে শ্রেণিসংস্কৃতি। নিম্নবর্গের ক্ষেত্রে এই রুচি হল

প্রয়োজনীয়তার রুচি, অন্যদিকে উচ্চ শ্রেণির মানুষের ক্ষেত্রে এই রুচি হল নিজের খুশিমতো চলা, বিলাসী জীবনযাত্রার এক অঙ্গ। রুচিসম্মত খাওয়াদাওয়ার এক বাহ্যাবয়ব আছে, ভাব, প্রকার, রকম আছে। এই বিধি বা রীতি প্রাথমিকভাবে এক ছন্দের বহিঃপ্রকাশ, এখানে প্রত্যাশা আছে, অপেক্ষা আছে, বিরাম আছে, সংযম আছে (শেষজনকে পরিবেশন না হওয়া অবধি কেউ খাওয়া শুরু করবে না)। বেশি হ্যাংলামি করা চলবে না, খাওয়ার জন্য বেশি অধীর হওয়া চলবে না। প্রতিটি পদের এক নির্দিষ্ট ক্রম আছে সেটা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। প্রজ্ঞাসুন্দরী তাই তার মেনুর নাম দিয়েছিলেন 'ক্রমণী'। যে কথা বাংলার রান্নার বইয়ে বারবার উচ্চারিত হয়েছে, সেটা হল শৃঙ্খলা ও নিয়মবিধি। এই শৃঙ্খলা ও নিয়মবিধি শুধু আহারের সময়ের জন্য নয়, প্রতিদিনের জীবনেও এটা মানতে হবে। সত্যি বলতে কি খাদ্যদ্রব্যের বিন্যাস ও ক্রমের মধ্যে একটা সামাজিক কোড (code) লুকিয়ে আছে। এই কোড সামাজিক সম্পর্কের কথা বলে, বিভিন্ন স্তরবিন্যাসের কথা বলে, অন্তর্ভুক্তি ও বহিষ্কারের ইঙ্গিত দেয়, সীমানা ও তার অতিক্রমণের কথা বলে।

পশ্চিমে খাওয়াদাওয়ার রীতিনীতিতে পরিবেশনের ক্রম প্রতিটি পদকে আলাদা আলাদাভাবে উপস্থিত করে, মাছ ও মাংস, চিজ ও ডেজার্ট একসঙ্গে সহাবস্থান করতে পারে না। এমনকি ডেজার্ট পরিবেশনের আগে টেবিলে যা কিছু আছে, এমনকি নুনদানি পর্যন্ত, সরিয়ে ফেলা হয়। এই কঠোর নিয়মকানুন যেন প্রদর্শিত করে আহার শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য নয়, বরং সেখানে রুচি, নান্দনিকতার একটি বড়ো পরিসর আছে। রান্না ও আহারের এক আনুষ্ঠানিক দিক আছে, স্টাইল আছে, তার বস্তুময়তা বা ক্রিয়ার চেয়ে তার ফর্ম বা পদ্ধতি কিংবা প্রণালী অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এই আনুষ্ঠানিক প্রদর্শনের এক অন্যদিকের কথা বলেছেন রঁলা বার্ত তাঁর 'অরনামেন্টাল কুকিং' নামে একটি লেখায় (*মিথলজিস*, ভিনটেজ : ১৯৯৩, পৃ. ৭৮-৮০)। বার্ত বলেছেন, *এলি* বলে একটি পত্রিকায়, যার পাঠক মূলত ওয়ার্কিং ক্লাস, প্রতি সংখ্যায় রান্না করা একটি পদের রঙিন ছবি প্রকাশিত হয়। ছবিটি যেন এক রূপকথার জগতের, রান্নার গার্নিশিঙ্গ আহার প্রস্তুতির বাস্তবের ধারকাছ দিয়ে যায় না, এ যেন এক স্বপ্নের রান্না। বার্ত বলছেন যেহেতু এই পত্রিকার পাঠক শ্রমিকশ্রেণি, তাই এই পত্রিকা সেই রান্না প্রদর্শিত করে, যা রান্না করার জন্য নয়, যা শুধু দেখার জন্য, যা এক রূপকথা, ম্যাজিক।

যাই হোক, প্রথম দিকের বাংলা রান্নার বইয়ের কথায় ফিরে আসি। এই বইগুলি গড়পড়তা বাঙালি মধ্যবিত্তের জন্য লেখা এবং অবশ্যই রুচিনির্মাণ প্রকল্পের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই রান্নার বইগুলি বাঙালি আহারের জগৎকে নিশ্চিতভাবে সম্প্রসারিত করেছিল,

একই সঙ্গে অথেন্টিসিটি বা প্রামাণিকতার একটা ধারণাও তৈরি করেছিল। প্রামাণিক দুইভাবে : এক, প্রজ্ঞাসুন্দরী যেমন লিখেছেন, 'প্রত্যেক খাদ্যটি সহস্তে রাঁধিয়া তবে লিপিবদ্ধ করিয়াছি', অর্থাৎ এই রান্নাগুলি কোনো কাল্পনিক রান্না নয় বরং পরীক্ষিত রান্না; দুই, রান্নার প্রক্রিয়ায় কোনো আপস বা সমঝোতা করা হয়নি, প্রকৃত রান্না করতে হলে এইভাবেই করতে হবে। অথেনটিক বাঙালি রান্নার ধারণা অবশ্য কোনোদিন-ই গড়ে ওঠেনি, কারণ আঞ্চলিক রান্নাকে অস্বীকার করা যায়নি। এই আঞ্চলিক রান্নার একটি দৃষ্টান্ত হল কিরণলেখা রায়ের *বরেন্দ্র রন্ধন* (সুবর্ণরেখা, [১৯১১] ২০০০)।

৩

একটা পুরোনো উক্তি আছে একজন কী খায়, তা দেখে বলে দেওয়া যায় সে কীরকম মানুষ। বুদ্ধদেব বসু তাঁর বাংলা খাবার নিয়ে লেখায় বলেছেন রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাসে মধুসূদন ধনার্জনে প্রতিভাবান, টাকা করে রূপোর বাসনে খেলেও তার প্রতিদিনের খাদ্য হলো কলাইয়ের ডাল, কাঁটাচচ্চড়ি, তেঁতুলের অম্বল এবং সবশেষে মস্ত বড়ো এক বাটি ভরতি চিনি মেশানো দুধ। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়ে দিয়েছেন 'বেচারা কুমুদিনী তার বায়বীয় ধরনধারণ নিয়ে কীরকম শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছে' (*ভোজনশিল্পী বাঙালি*, বিকল্প, ২০০৪, পৃ: ৭)। তবে রুচি বিচার করতে গেলে শুধু কী খায় দেখলে চলবে না, কীভাবে খায় সেটাও দেখতে হবে। গোপাল হালদার লিখেছেন ভোজের পরম পরিণতি হল দেহ-মন-আত্মার আত্মপ্রসারে। 'গৃহসজ্জা থেকে ভোজন-গৃহের সাজানো-গোছানো, কলা-মণ্ডিত ফুলের 'ভাস', ফুল, ফুলের তোড়া, ফুলদানি, টেবিলের সজ্জা, আলো, চারু-চিত্রিত নানা উপকরণ, প্লেট ছুরি কাঁটা, কফি সেট, পরিবেশনের সঙ্গে পোশাক—এইসব হল 'প্লেজার্স সব টেবলের' একদিক' (*আড্ডা*, পুঁথিপত্র [১৯৫৬] ২০০৪, পৃ. ৩৬)। তিনি লিখেছেন যে জমিদার তালুকদারদের পঙ্‌ক্তিভোজন ছাড়িয়ে ইংরেজ আমলে বাঙালি শিক্ষিত শ্রেণি একটা রস ও রুচির নিরিখ তৈরি করেছিল কিন্তু তার আশ্রয় রয়ে গেছে পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে। কেন এমন হল তার উত্তরে লিখেছেন : 'তাছাড়া আর উপায় কি? আমাদের রাজ্য নেই, রাজকীয় খানাপিনা নেই, স্টেট ডিনার ও সুসম্পন্নদের মেলামেশার পার্টি নেই, অবসর বিনোদনের ক্লাব নেই। সমস্ত কলকাতা শহরে একটা বাঙালী রান্নার হোটেলও নেই। স্বাধীন, স্বনির্বাচিত পরিবেশের সেরকম আত্মকেন্দ্রিত তৃপ্তি আমরা তাহলে পাব কোথা থেকে? এই মধ্যবিত্ত জীবনের সীমাবদ্ধ, আদান-প্রদানের মধ্যেই তাই গড়ে উঠেছিল বাঙালি ভোজনরীতি' (ওই, পৃ. ৬২)।

তিনি মনে করতেন, বাঙালি খাওয়ার ব্যাপারে 'না গ্রহণ না বর্জন নীতিতে' সহনশীল। বাঙালি বাড়ির নিমন্ত্রণে প্রস্তাবনায় আদি ও অকৃত্রিম শাক, ঘণ্ট, চচ্চড়ি, তারপর আসবে মোগলাই পোলাও, কালিয়া, কোপ্তা, কাবাব এবং আসবে বাঙালির অ্যাংলো-বেঙ্গলি পর্বের চপ-কাটলেট থেকে আইসক্রিম পর্যন্ত। লিখেছেন : 'নিমন্ত্রণ তো নয়, এ বাঙালীর ইতিহাস...বাঙালীর নিমন্ত্রণে আজ নিমন্ত্রিত হয় বাঙালী অতিথির তিন জন্মের তিন সত্তা। সেই আদি জন্মের গেঁয়ো বাঙালী সত্তা তার মধ্যজন্মের আধা-মুসলমানী সত্তা, আর তার ইংরেজী আমলের আধা-ঔপনিবেশিক সত্তা। কিন্তু সত্তা যত বিচিত্র হোক, হায়, উদর মাত্র একটি' (ওই, পৃ. ৫১)। তিনি মনে করতেন এই আহারে বাহুল্য আছে, কোনো সংযম নেই, তাই কোনো রুচিও নেই। এর মধ্যে মৌলিকতা নেই, নেই আত্মপ্রকাশ ও আত্মীকরণ : 'পোলাও-কোর্মা, চপ-কাটলেট, আইসক্রীম-ঝোল-ঝালকে পিঠে-মিষ্টান্নের মত আমরা এখনো আপনার করে ফেলতে পারিনি, এখনও তা ঋণই আমাদের পাক পদ্ধতিতে' (ওই, পৃ. ৫১)।

আসলে বাঙালি রসনার রুচি প্রকাশিত হয় মূলানুগত্যে, বাঙালির মৌলিক রান্নায়, নিমপাতা-কাসন্দির ঝোল, ওগ্‌রা ভাতে, নলতে শাকে, মৌরলা মাছে, এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধেই কিন্তু বাংলা ভাষায় যাবতীয় রান্নার বই লেখা হয়েছে। মূলানুগত্য কিন্তু একভাবে অথেন্টিসিটির কথা বলে। অথেন্টিক বাংলা রান্নায় বাঙালি রসনার রুচি এ তত্ত্ব মানতে গেলে হিঞ্চে শাক, গিমে শাক, সজনে ডাঁটা, সুক্ত, চচ্চড়ি খেয়ে থাকতে হয়। অন্যদিকে বিপ্রদাস তাঁর *পাক-প্রণালী* বইয়ে লিখছেন চপ, কাটলেট্, বিজাতীয় খাদ্য। কিন্তু হিন্দু সমাজে দিন দিন এই সকল খাদ্যের আদর বৃদ্ধি হচ্ছে, তাই তিনি এর প্রস্তুত প্রণালী দিচ্ছেন। চপ্, কাটলেট্, কোপ্তা, কাবাব হিন্দু রসনায় যাতে গ্রহণযোগ্য হয় সে-ব্যাপারেও তিনি ভরসা দিয়েছেন : 'চপ, কাটলেট্ এবং কোপ্তা আদিতে মাছ ও মাংস প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চপ ও কাটলেট্ প্রভৃতি রন্ধনের নিয়ম একরূপ নহে। কেহ যদি পিঁয়াজ, রসুন, ডিম এবং বিস্কুট ত্যাগ করিয়া পাক করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহাও প্রস্তুত হইতে পারে; কিন্তু, ঐ সকল উপকরণ দ্বারা প্রস্তুত করিলে, যেরূপ সুস্বাদু ও উপাদেয় হইয়া থাকে, অন্যান্য উপকরণে সেরূপ হইতে পারে না। বিশুদ্ধ হিন্দু মতে চপ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হইলে, পিঁয়াজ ও রসুনের পরিবর্তে হিঙ্ ও আদার পরিমাণ কিছু অধিক দিতে হয়। আর ডিমের পরিবর্ত্তে বেসন পাতলা করিয়া গুলিয়া কিংবা জল অথবা সাগু, এরারুট বাঁধিয়া বা চন্দন-ক্ষীর ব্যবহার করিতে হয়। বিস্কুট ব্যবহার না করিয়া তৎ-পরিবর্তে বেসন বা সুজি কিংবা এরারুট অথবা টাটকা মুড়ির গুঁড়া ব্যবহার করিলে চলিতে পারে' (পৃ. ১৯৪)। হিন্দুদের কাছে চপ, কাটলেট গ্রহণযোগ্য করার

জন্য কত প্রচেষ্টা। প্রজ্ঞাসুন্দরী অবশ্য এরকম কোনো আপসের চেষ্টা করেননি। তাঁর মনোভাব হল পছন্দ হলে খাও আর তা না হলে খেয়ো না। ইমান্যুয়েল কান্ট মনে করতেন বিভিন্ন রকম মানুষ ও তাদের সংস্কৃতিকে জানাই একজনকে সভ্য করে তোলে; তাকে বিশ্বের নাগরিক করে তোলে। তিনি মনে করতেন এই জ্ঞানের শুধু বৈজ্ঞানিক মূল্য নেই, বরং আত্ম-জ্ঞানের জন্যও এই জ্ঞান উপযোগী। কান্ট একে বলেছেন 'কসমোপলিটান নলেজ' বা সংস্কারমুক্ত জ্ঞান। আমাদের আলোচিত রান্নার বইগুলিও তাই। উনিশ শতকে বাঙালি জীবন যখন ধর্ম-আচার-সংস্কার-এর এক সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল, সেই সময় প্রকাশিত রান্নার বইগুলিতে এক উন্মুক্ত চিন্তার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে বলি উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের শুরু অবধি বাঙালি নারীদের জন্য পত্রিকায় প্রকাশিত হত ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের নানারকম রান্না, বাঙালি নারীদের রান্নাঘরের জগৎকে প্রসারিত করার জন্য, খাদ্যরুচির সীমানা পরিবর্ধিত করার জন্যও। কিছু দৃষ্টান্ত দিই : মাছের সিক্-কাবাব, ব্রেডিং চপ (কিমা মাংস, তেঁতুল ইত্যাদি দিয়ে তৈরি) (*পুণ্য*, ফাল্গুন ১৩১০); ছাগল বা ভেড়ার মাংসের হুশ্‌নি কারী (*পুণ্য*, ৩ (৪), ১৩০৬); ডিমের লক্ষ্ণৌয়ি হালুয়া (*পুণ্য*, শ্রাবণ ১৩১১); হিন্দুস্থানী ধরনে করলার ব্যঞ্জন (*অন্তঃপুর*, চৈত্র ১৩১০); মহারাষ্ট্রীয় পিষ্টক ও পায়স (একটি মহারাষ্ট্রীয় কন্যা কর্ত্তৃক লিখিত) (*মহিলা*, সেপ্টেম্বর ১৯০১); মহারাষ্ট্রীয় দইকারি ও চারুপানি, উৎকলের পালো পাথাল বা পান্তা (*মহিলা*, নভেম্বর ১৯০০); উৎকল এবং মহারাষ্ট্রের পোড়া পিটা ও বেসনের তরকারি (*মহিলা*, জানুয়ারি ১৯০১); সিন্ধু দেশের রুটি (*মহিলা*, এপ্রিল ১৯০২); ডুমুরের ক্রকেট (Croquette) (*পরিচারিকা*, অগ্রহায়ণ, ১৩১০); ভেটকী মাছের বিলসন্, নামকি পোলাও, জয়পুরী কোর্ম্মা। (*পুণ্য*, মাঘ ১৩১০)। রান্নার বই তাই অসাধারণ সাংস্কৃতিক গল্প বলে আমাদের। রান্নার বইয়ে সাধারণভাবে ম্যানুয়ালের যা বৈশিষ্ট্য, প্রয়োগমুখিতা, তা যেমন আছে, তেমনি আছে রস গ্রহণের সাহিত্য। এই বইগুলি খাদ্যা-খাদ্যের সীমানা পরিবর্তিত করে, রন্ধনবিদ্যার সমীচীনতা-অসমীচীনতা নির্ধারিত করে, আহারের যুক্তি ও রুচির নিদেশ দেয়, পারিবারিক অর্থনীতির চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার কথা মনে রাখে এবং বাজার ও পরিবারের ভাবাদর্শকে প্রতিফলিত করে। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত রান্নার বইগুলি কীভাবে বাঙালি পরিবারের ডিসকোর্সে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, সে-কথা আমি আমার 'আদর্শ পরিবারে আদর্শ রন্ধনপ্রণালী' (*পারিবারিক প্রবন্ধ*, গাঙচিল,২০১২, পৃ. ১৩৭-১৬২) প্রবন্ধে লিখেছি, সুতরাং এখানে তার পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই। শুধু

এইটুকু বলি যে রান্নার বইগুলি দেখায় যে আহার এক স্বাধীন উদ্যোগ হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে, এই স্বতন্ত্রতা নৈতিকতা এবং ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা থেকে স্বাধীনতা।

৪

এই যে রান্নার বইয়ে দেশি-বিদেশি আঞ্চলিক নানাবিধ রান্না সংকলিত হয়েছে প্রথম দৃষ্টিতে তাকে হচপচ পাঁচমিশেলি এক সংকলন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এর গভীরে বাঙালি ভোজনের এক ধারণা আছে, যে ধারণার সঙ্গে বিপ্রদাস, প্রজ্ঞাসুন্দরী থেকে আধুনিক যুগের রেণুকা দেবী চৌধুরানী (*রকমারি নিরামিষ রান্না*, সুবর্ণরেখা, ১৯৮৮; *রকমারি আমিষ রান্না*, আনন্দ, ২০০০), লীলা মজুমদার (*রান্নার বই*, আনন্দ, ১৯৭৯) সকলেই একমত। সেটা হল এই রান্নাগুলি সাজানো হয়েছে একটা ক্রম হিসেবে; ভাত, শুক্তানি, ডাল, নিরামিষ তরকারি, ডিম, মাছ, মাংস, অম্বল, মিষ্টি ইত্যাদি। মোটামুটি এই হল স্ট্রাকচার। লক্ষ করলে দেখা যাবে ভোজনের 'স্বাভাবিক' ক্রমটুকু যেন রক্ষা করা হয়েছে, কিন্তু এর পিছনে মেনুর একটা আইডিয়াও যেন কাজ করছে, যে মেনুর কথা বলে এই প্রবন্ধ শুরু করেছিলাম।

আগেই বলেছি পশ্চিমে মেনুর সঙ্গে ভোজ্যবস্তুর পরিবেশনের একটা ক্রম যুক্ত আছে। সেখানে বিভিন্ন পদের ক্রম কঠোরভাবে মেনে চলা হয়, বিভিন্ন পদের সঙ্গে আহারের নানাবিধ রীতিনীতিও মানতে হয়। আমাদের দেশে আহার্য পদগুলি একসঙ্গে পরিবেশিত হয়, থালার চারিদিকে বহু বাটি সাজিয়ে বিভিন্ন পদের পরিবেশনের কথা আমরা কত পড়েছি। আমাদের ক্ষেত্রে সব পদ একসঙ্গে আসে। বিদেশের মতো আমাদের কোর্স নেই। কিন্তু রান্নার বইয়ে মেনুর এই আইডিয়া বাঙালি-অবাঙালি সবরকম খানাকে একসঙ্গে সন্নিবেশিত করতে পারে। পরে আমরা দেখব আজকের দিনের রান্নার বইয়ে যখন উত্তর থেকে দক্ষিণ বিভিন্ন রাজ্যের খাবারের কথা লেখা হয় তখন যে অন্তর্নিহিত সূত্রে এইসব রকমারি রান্না গাঁথা থাকে তা হল এই মেনুর ধারণা।

লক্ষ করতে হবে একদম প্রথম থেকেই মোগলাই খানা এবং কলোনিয়াল খানাপিনা বাংলা রান্নার বইয়ের অঙ্গ হয়ে গেছে। মোগলাই খানা মূলত রাজারাজড়াদের খাবার যা মোগল রাজাবাদশাদের তুর্কি-আফগান রন্ধনকৌশলের সঙ্গে উত্তর ভারতের কৃষকদের খাবারের আন্তঃক্রিয়ার ফলে বিকশিত হয়। এই মোগলাই খানার বিস্তারিত বিবরণ আছে *পাকরাজেশ্বর:* ও *ব্যঞ্জন রত্নাকর* (সুবর্ণরেখা, ২০০৪) বই দু'টিতে। মোগলাই খানায় উত্তর ও পশ্চিম ভারতের যদিও বা কিছু অবদান থাকে, পূর্ব বা দক্ষিণ ভারতের কোনো অবদানই নেই। যদি ভারতীয় রান্না বলতে আমরা বুঝি সেই রান্না যা ভারতের

বিস্তীর্ণ আঞ্চলিক রান্নাগুলি থেকে নিজের উপাদান সংগ্রহ করেছে, তাহলে মোগলাই রান্না ভারতীয় নয়। কিন্তু বাংলা রান্নার বইয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে আছে এই মোগলাই খাবার। এই কারণে নিশ্চয়ই যে এইসব খানার প্রতি বাঙালির অসীম আকর্ষণ। একটু আগেই আমরা দেখেছি যে বিপ্রদাস হিন্দুদের মনোমতো করে এই রান্না কীভাবে করা যায় তারও নির্দেশ দিয়ে গেছেন। মনে রাখতে হবে মোগলাই ও কলোনিয়াল রান্না এখানে জনপ্রিয় হয় রেস্তোরাঁ, ক্লাব প্রভৃতির মাধ্যমে। বিদেশিদের কাছে মোগলাই খানা ভারতীয় খানার সমার্থক হয়ে ওঠার কারণও বিখ্যাত রেস্তোরাঁগুলি।

সাহেবি খানার মধ্যে স্যুপ, স্টু, চপ্, কাটলেট, রোস্ট, পুডিং প্রভৃতি বাংলা রান্নার বইয়ে এক আবশ্যিক মেনু হয়ে দাঁড়ায়। প্রজ্ঞাসুন্দরী এইসব রান্নার কৌশল বিস্তারিত আলোচনাই শুধু করেননি, আহার হিসেবে মেনুও তৈরি করে দিয়েছেন। যেমন : 'মুলুকতানি সুপ, ভাত, ট্যাংরা মাছের স্টু, মাংসের ক্রাম চপ্, আলু সিদ্ধ, তিতির রোস্ট, আলুর ঝুরি ভাজা, কেবিনেট পুডিং, ডের্জাট, কফি' (পৃ: ৪৫৫)। প্রায় একশো বছর পর লেখা লীলা মজুমদারের *রান্নার বই*-তে দেখি এগুলি বাঙালি আহারের প্রায় স্বাভাবিক অঙ্গ হয়ে উঠেছে। তাঁর বইয়ে এইসব রান্না অন্য আর পাঁচটা রান্নার মতোই এসেছে, যেন এগুলি বাঙালি ভোজ্যতালিকারই অঙ্গ। তিনি যেসব রান্নার প্রস্তুতপ্রণালী দিয়েছেন তার মধ্যে আছে : চিজ ও ডিমের স্যুপ, মিনিস্ট্রোন, স্কচ ব্রথ, মুরগির জগ স্যুপ, স্প্যানিশ অমলেট, মাছের ক্রোকেট, সহজ রোস্ট, কেক-বিস্কিট প্রভৃতি। শুধুমাত্র ক্লাব, রেস্তোরাঁ, হোটেল নয়, বাংলা রান্নার বইয়ের মাধ্যমেও মোগলাই ও সাহেবি খানা ভারতীয় এবং বিশেষ করে বাঙালি আহারের অংশ হয়ে গেছে, একই সঙ্গে বাঙালি রুচি, শ্রেণি, মর্যাদা, স্টেটাসেরও এক নির্দেশক হয়ে উঠেছে।

৫

সময় যত এগিয়েছে বাংলা রান্নার বইয়ের ক্ষেত্র তত প্রসারিত হয়েছে, রান্নার বইয়ের বিশেষীকরণ হয়েছে, সমাজের বিশেষ বিশেষ অংশ, যেমন শিশু, চাকুরিরত মহিলা, এদের জন্য বই লেখা হয়েছে, জলখাবার, কোপ্তা কাবাব, নিরামিষ রান্না, প্রভৃতি আলাদা ক্যাটিগরি নিয়ে বই লেখা হয়েছে, এমনকি বীণাপাণি দেবীর লেখা *মেয়েদের পিকনিক* (চক্রবর্তী চ্যাটার্জী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৫৪) বিষয়েও বই আছে। অন্যদিকে নতুন টেকনোলজি, রান্নাঘরের সরঞ্জাম, মিক্সার-গ্রাইন্ডার, ব্লেন্ডার, ফ্রিজ, মাইক্রোওভেন প্রভৃতি সৃষ্টি করেছে নতুন নতুন রান্নার বই। সাধারণভাবে বলা যায় যে যে-বিষয়গুলি রান্নার বইয়ের একদম কেন্দ্রে আছে সেগুলি হল : (১) স্বাস্থ্যকর, সুষম, সামঞ্জস্যপূর্ণ, পুষ্টিকর

আহার; (২) পারিবারিক অর্থনীতি ও বাজেটের কথা মনে রেখে আহার প্রস্তুতপ্রণালী, একই সঙ্গে সময়ের অপচয় যাতে বন্ধ সেই রকম রন্ধনপ্রণালী; (৩) অথেনটিক, আকর্ষণীয়, বৈচিত্র্যপূর্ণ, সমসাময়িক সময়ের চাহিদা অনুযায়ী রান্না; এবং অবশ্যই রুচিনির্মাণ।

নীহারবালা দেবী তাঁর *আদর্শ রন্ধন শিক্ষা* (নারী সাধনালয়, ২য় সংস্করণ, ১৯১৪) বইতে ভিটামিন, ফ্যাট, সল্ট ও প্রোটিনের বিবরণ দিয়েছেন, দৈনন্দিন রান্নায় কীভাবে এই জ্ঞান প্রয়োগ করা যায় নীহারবালা তার মেনুও বাতলেছেন। আরও পরে প্রকাশিত সুলেখা সরকারের *রান্নার বই*-এ (এম সি সরকার, ১৯৭০) বিস্তারিত আলোচনা আছে ভিটামিন, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, মিনারেল, সল্টস্, ক্যালোরি ইত্যাদির। আরও সাম্প্রতিককালে ইন্দ্রানি লাহিড়ি লিখেছেন *লো-ক্যালোরি লো-ফ্যাট রান্না* (আনন্দ, ২০০৯)। আহারের সঙ্গে শুধুমাত্র শারীরিক সুস্থতা নয়, শারীরিক সৌন্দর্যের সম্পর্কের কথাও মনে রাখতে হবে। যা মানুষের শরীরকে সুন্দর, স্লিম, ফিট রাখে, তাই রুচিশীল, আহার। ইন্দ্রাণী লিখেছেন : 'আমার নিজের পরিমিত তেল মশলাতে সুষম সুস্বাদু পুষ্টিকর রান্নাতেই বিশ্বাস ছিল এবং এই আদর্শ মাথাতে রেখেই *চেনা অচেনা নানান রান্না* লিখেছিলাম। [এখন] একটু অন্যভাবে চিন্তার সময় এসেছে এবং দরকার আছে। এবারে লিখতে হবে যথাসাধ্য কম তেল দিয়ে কম ক্যালোরির দিকে দৃষ্টি রেখে। শুধু তাই নয়, এমন তেল বা মার্জারিন ব্যবহার করতে হবে যেটা কোলেস্টরলমুক্ত এবং যেটুকু ফ্যাট আছে সেটা শরীরের জন্য ক্ষতিকারক নয়। কেন এমন কিছু লিখতে চাইলাম...স্বাস্থ্যসচেতন কমবয়েসিরা [এই] ধরণের খাবারই পছন্দ করে। সবাইকেই জীবনধারণের জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়, তাই তারা চায় না হঠাৎ শরীরে মেদ জমিয়ে বেঢপ হয়ে সৌন্দর্য হারাতে বা জীবনের স্বচ্ছন্দ সচলতা হারাতে' (আমার কথা)। শরীরকে সুন্দর, মেদহীন, ফিট রাখতে আহারে সংযম প্রয়োজন, এই হল আধুনিক ধারণা। মানুষ পারুক না-পারুক একে অস্বীকার করতে পারে না। তাই আজকে অতিরিক্ত ফ্যাট, শর্করা, তেল, ঘি দিয়ে রান্না ও আহারকে কুরুচিরকর বলে মনে করা হয়।

আমাদের সমাজকে বলা হয় সোসাইটি অফ নর্মালাইজেশন। এই সমাজ সকলকে এক ছাঁচে ঢেলে সাজাতে চায়, মানুষকে একই ধরনের চিকিৎসাবিধি, স্বাস্থ্যবিধি, আদর্শ, মডেল, নৈতিকতা মেনে চলতে প্ররোচিত করে। যার ফলে উদ্ভাবিত হয় এক সর্বস্বীকৃত লাইফস্টাইল, জীবন পরিচালনার উপায়। রান্নার বইগুলি এ-সম্পর্কে এক বিস্তারিত ধারণা দেয়। রুকমা দাক্ষী তাঁর *কম তেলে রান্না*। (আনন্দ, ২০১১) বইতে বলেছেন সুন্দর শরীর আর মন কে না চায়? আজকের দিনে মানুষের নানা ধরনের মানসিক

স্ট্রেসে ভুগতে হচ্ছে, এবং সেই কারণে নানা স্ট্রেস-রিলেটেড রোগ দেখা দিচ্ছে। এর জন্য প্রয়োজন লাইফ স্টাইল ম্যানেজমেন্ট, সংযত আহার বা ডায়েট ফুড, যা হবে অল্প বা বিনা তেলে সহজ পাচ্য সুস্বাদু আহার। লিখেছেন : 'ডায়েট কী?... এইসব নিয়ে এত চিন্তা করার কোনও কারণ নেই। বিভিন্ন পুষ্টিকর তেলবিহীন অথবা নামমাত্র তেলে রান্না কিছু রেসিপি দেওয়া হল। এর থেকেই বেছে নিন আপনার আদর্শ ও উপযোগী সারাদিনের ডায়েট প্ল্যান। অতিরিক্ত তেল মশলাদার খাবার বাদ দিয়ে হেলদি ইটিং হ্যাবিট গড়ে তুলুন। আমার মতে আপনার লাইফ স্টাইল-এর উপর নির্ভর করবে আপনার ডায়েট চার্ট। ...ভালো লাগবে যখন দেখবেন এক থেকে দেড় মাস ওই ডায়েট পালন করে আপনি আরও সুন্দর ও তন্বী হয়ে উঠেছেন' (পৃ. ৩-৫)। রুকমা এরই সঙ্গে কয়েকটি আদর্শে মেনু দিয়েছেন, তার থেকে দুটি মেনুর উল্লেখ করছি :

মেনু-১

১। মর্নিং	চা-বিস্কুট
২। ব্রেকফাস্ট	২টো চিল্লা, ধনিয়া দই ডিপ, স্কিমড মিল্ক অথবা লিকার চা
৩। মিড মর্নিং	স্কিমড মিল্ক লস্যি চিনি ছাড়া
৪। লাঞ্চ	ভাত (১ ছোট কাপ), করলার ঝাল, অড়হর ডাল, স্যালাড, স্টিমড্ চিকেন (সবজি দিয়ে)
৫। ইভনিং স্ন্যাক্স	চা, পালং শাকের কাটলেট
৬। ডিনার	লেনটিল স্যুপ, ফিস স্যালাড, ২টি টোস্ট, ফ্রুট স্যালাড

মেনু-২

১। মর্নিং	চা-বিস্কুট
২। ব্রেকফাস্ট	নোনতা ওটস, ১টা ফল, ১ কাপ স্কিমড মিল্ক
৩। মিড মর্নিং	ফ্রেশ লাইম জুস (চিনি ছাড়া)
৪। লাঞ্চ	মশালা পরোটা, পোস্ত চাটনি, ডাল-টম্যাটো, খাট্টা-মিঠা ভেণ্ডি, আনারস এবং চিকেন স্যালাড
৫। ইভনিং স্ন্যাক্স	চা, চানা ফ্রাই
৬। ডিনার	হট অ্যান্ড সাওয়ার স্যুপ, জিরা রাইস, মেথি দিয়ে আড়, ফুলকপির কাসুন্দি, ছানার পুডিং।

বলা হয়েছে এই সব খাবার খেলে 'শরীর থাকবে সুন্দর, সুস্বাদ পেয়ে মনও হয়ে উঠবে খুশি খুশি!

রুকমা তাঁর বইতে মাংস রান্নার প্রণালী বলেছেন যাতে মাত্র দু-চামচে তেল লাগে। অন্যদিকে মনে করুন *পাকারাজেশ্বর*: বইতে দেওয়া মাংস রান্না। যেখানে কোনো মাংসই এক সের ঘি-এর কমে রন্না হয় না। মাংসের শিককাবারের উপাদান হল ১ সের মাংস, ২৫টা হাঁসের ডিম, ১ সের ঘি, দারচিনি, এলাচ, মরিচ, ইত্যাদি। সামান্য করলার দুটি রান্না দেখা যাক। রুকমার করলা রান্নার উপাদান হল : ৪টে করলা, ২ চামচ তেল, এছাড়া ১ চামচ করে সরষে বাটা, পোস্ত বাটা, কাঁচালঙ্কা বাটা, কালোজিরে, ইত্যাদি। অন্যদিকে *ব্যঞ্জন রত্নাকর* বইতে দেওয়া করলা রান্নার উপাদান বলি। রান্নার নাম হল : 'করেলার শুষ্ক প্রলেহ', এতে লাগবে ১ সের মাংস, ১'সের করলা, ৬ পোয়া ঘী, ৪ পোয়া দই ও আনুষঙ্গিক মশলা। পার্থক্যের কারণ এই নয় যে আজকে আমরা অনেক বেশি জ্ঞান আহরণ করেছি, বরং এই যে আধুনিক রান্নার বইয়ের সঙ্গে চিকিৎসাবিদ্যা-সংক্রান্ত ডিসকোর্সের এক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগ তৈরি হয়েছে। সেই কারণেই একদম প্রথম যুগ থেকে রান্নার বইয়ে পথ্য-প্রস্তুতপ্রণালী একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। রান্নার বইগুলি প্রচলিত স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণাকেই আধুনিক পপুলার স্তরে উপস্থিত করে। *পাকরাজেশ্বর:* ও *ব্যঞ্জন রত্নাকর* যখন লেখা হয় তখন এই বাধ্যবাধকতা ছিল না।

৬

যে কাঠামোর মধ্যে বাংলা ভাষায় আধুনিক রান্নার বই লেখা হয়েছে তার মধ্যে পারিবারিক অর্থনীতি, বাজেট, আয়-ব্যয় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে একথা আগেই বলেছি। লীলা মজুমদার তাঁর *রান্নার বই*-এ লিখেছেন : 'ভালো করে খাওয়া মানে এমন খাওয়া যার স্বাদ ভালো, গন্ধ ভালো, দেখতে ভালো, বেশি পুষ্টিকর, সহজে ও কম সময়ে, কম খরচে রাঁধা যায়' (ভূমিকা)। বাংলায় যাঁরা এন্‌সাইক্লোপিডিক রান্নার বই লিখেছেন, যেমন, প্রজ্ঞাসুন্দরী বা রেণুকা দেবী, তাঁরা আয়-ব্যয়-এর কথা সেইভাবে ভাবেননি, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল রান্নার বৈচিত্রকে তুলে ধরা, তা সে ব্যয়বহুল হোক না কেন। বিপ্রদাস *পাক-প্রণালী* বইতে লিখেছেন : 'সামান্য অবস্থাপন্ন হইতে ধন-কুবের ভোগবিলাসী পর্যন্ত, সকলেই পাক-প্রণালীর প্রতি আদর করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং কেবল যদি সামান্য শ্রেণীর উপযোগী অর্থাৎ যৎসামান্য ঘৃত মসলা দ্বারা রন্ধনের নিয়ম লিখিত হয়, তাহা হইলে, উচ্চ শ্রেণীর ভোক্তাদিগের রসনায় তাহা স্থান পায় না, এবং কেবল যদি তাঁহাদিগের রসনার যোগ্য রন্ধনের বিষয় লিখিত হয়, তাহা হইলে, সামান্য গৃহস্থাদিগের পক্ষে তাহা কোন কার্যকারক হয় না। এ জন্য সামান্য হইতে বহু ব্যয়সাধ্য সকলপ্রকার রন্ধনের বিষয়ই প্রকাশ করা হইল' (পৃ. ৩০)।

পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত রান্নার বইগুলিতে এক ধরনের সুক্ষ্ম চাপ কাজ করতে দেখা যায়। রান্নার বইয়ের জগতের প্রধান উপভোক্তা ও টার্গেট হয়ে ওঠেন বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এই শ্রেণির কাছে অর্থ ও সময়ের বাজেট এক কেন্দ্রীয় বিষয়। তাই এই সময়ের নানা রান্নার বইয়ে অর্থ ও সময় কীভাবে সাশ্রয় করা যায়, নানাবিধ পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অনেক রান্নার বইয়ে চাকুরিরতা নারীর উপর যে দ্বৈত চাপ কাজ করে, সংসারের জন্য উপার্জনের চাপ এবং পরিবার, জ্ঞাতি, বন্ধুবান্ধবদের জন্য রান্নাবান্নার একটা মান অর্জন করার চাপ, একথা খোলাখুলি স্বীকার করা হয়েছে। শুভ্রা সেন তাঁর *রকমারি কাবাব* (আনন্দ, ২০১১) বইটি উৎসর্গ করেছেন : 'রান্নায় উৎসাহী টিন-এজার নারীপুরুষ ও চাকুরিরতা ব্যস্ত গৃহিণী যাঁরা খুব সহজে ও কম সময়ে মুখরোচক কিছু খাবার বানিয়ে খেয়ে ও খাইয়ে আনন্দ পান তাঁদের জন্য।' অর্থাৎ আজকের চাহিদা হল পুষ্টিকর, স্বাস্থ্যকর, অথেনটিক, আকর্ষক খাবার তো হতেই হবে, একই সঙ্গে গুরুত্ব দিতে হবে মিতব্যয়িতা, কার্যকারিতার উপরও।

এর ফলে এক নতুন ধরনের রান্নার উৎপত্তি হয়েছে যাকে বলা হয়েছে 'ফেলাছড়ার রান্না'। ফেলা-ছড়া বা বাসি খাদ্যবস্তু সম্পর্কে হিন্দু চিন্তাভাবনা অত্যন্ত স্পর্শকাতর। সাধারণভাবে বাসি, উচ্ছিষ্ট, বেঁচে যাওয়া, ফেলা-ছড়া খাবার খাওয়ার সঙ্গে মর্যাদাহানি, জৈবিক দূষণ, নৈতিক অধঃপতন প্রভৃতি বিষয়গুলি যুক্ত। হিন্দু চিন্তায় এই খাদ্যবস্তুগুলিকে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে তা প্রায় সামাজিক আচার-আচরণের কেন্দ্রে রয়েছে। অথচ দেখি রান্নার বইগুলি, যাদের কোনোমতেই র‍্যাডিকাল বলা যাবে না, প্রায়শই আমাদের উপায় বাতলাচ্ছে, কীভাবে এই বস্তুগুলিকে ব্যবহার করা যায়। দেখা যাক এ ব্যাপারে লীলা মজুমদার কী বলছেন : ' [আমাদের ছোটবেলায়] যে খাবার ফেলা যেত, তাই দিয়ে একটা ছোট গরীব পরিবারের অনেকখানি চলে যেত। নেহাত এঁটো বলে ফেলা যেত! পাতে না ফেললে লোকে হা-ভাতে বলে নিন্দা করত। সুখের বিষয় সে-সব দিন গেছে। আমাদের মনে হয় কারো বাড়িতে এক দানা ভাত কি এক চামচ রান্না জিনিস নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয়। ঝড়তি-পড়তি দিয়ে কতরকম ভালো রান্না করা যায়। যেমন, চুপ্-সুয়ে, হ্যাশ...। রান্না সম্বন্ধে গোঁড়ামি ভালো নয়' (ভূমিকা)। বহু বইয়ে আলাদা একটি অধ্যায় থাকে কীভাবে ফেলা-ছড়া ঝড়তি-পড়তি ব্যবহার করা যেতে পারে।

এ বিষয়ে সাধনা মুখোপাধ্যায় *ফেলাছড়ার রান্না* (আনন্দ, ১৯৮৭) নামে আলাদা একটা বই অবধি লিখে ফেলেছেন। এই বইয়ের পরিচয়ে বলা হয়েছে যারা মনে করেন রান্নার বই মানে বাজার থেকে দুষ্প্রাপ্য ও দামি উপকরণ কিনে রান্না করা, এই বইটি

সেই ভাবনার মূর্ত প্রতিবাদ। প্রতিদিনের সংসারে যে-সব জিনিস ফেলা-ছড়া যায়, সেইসব উপরকণ দিয়েই 'দারুণ স্বাদু এবং দারুণ উপকারী' রান্নার সংকলন এই বইটি। লেখা হয়েছে : 'ফেলে-দেওয়া, তরকারির খোসা, ফেটে যাওয়া দুধ, বাসি ভাত, বাসি রুটি-পাউরুটি, বাসি কিমা কিংবা চিংড়িমাছ, মাংসের হাড়, ছাল, চিংড়িমাছের খোলা, মটরশুঁটির খোসা, ভাতের ফ্যান এমন সমস্ত কিছু দিয়ে কীভাবে তৈরি করা যায় স্বাস্থ্যকর নানান লোভনীয় পদ-এ বইতে সেইসব প্রণালীই বর্ণনা করেছেন তিনি'। সাধনা লিখেছেন এইসব উপকরণ সহজেই পাওয়া যায়, অথচ এদের মাধ্যমে কম খরচে শরীরের পক্ষে দামি দামি উপাদান যেমন, লোহা, স্টার্চ, ভিটামিন, প্রোটিন, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি পাওয়া যায়। ফেলা-ছড়া খাবারের মাধ্যমে আহার তার ঐতিহ্যিক নৈতিক ও সামাজিক কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু বেরিয়ে এসে এক নতুন এটিকেট-সিস্টেমে গ্রথিত হয়, এই এটিকেট ড্রইং রুম, ক্লাব, রেস্তোরাঁর এটিকেট, এটাও মনে রাখতে হবে।

এতো গেল খাদ্যের অপচয় বিষয়ক সমস্যার সধাধান। আর সময়ের অপচয়? রান্নার বই লেখা হয়েছে সময়ের অপচয় রোখবার জন্যেও। জয়শ্রী গঙ্গোপাধ্যায় *দশ মিনিটে রান্না* (আনন্দ, ২০১১) বইতে লিখেছেন : 'চটজলদির যুগ চলছে, তরিবত করে রান্না করার সময় কোথায়? এদিকে বাইরের খাবারও খাওয়া চলবে না। তাহলে উপায়?' উপায় হল হোম ম্যানেজমেন্ট-এর জন্য প্ল্যানিং। সঙ্গে থাকবে ফ্রিজ, মাইক্রোওয়েভ। মাথা খাটিয়ে উপকরণগুলো মজুত রাখতে হবে। ব্যস, দশ মিনিটে কেল্লা ফতে। সুস্বাদু স্বাস্থ্যকর খাবার তৈরি। এ হল আজকের 'গতিময় যুগের' ছেলে-মেয়েদের জন্য রান্নার গাইড বুক। শর্মিলা বসুঠাকুরের লেখা *একশো ক্যালোরি ১০০ রেসিপি* (আনন্দ, ২০১০) বইতে অত্যধিক ক্যালোরি সম্বলিত আহারের বিরুদ্ধে সতর্ক করে, কম ক্যালোরির আহার চটপট তৈরি করা যায় তার উপায় বাতলেছেন। এইসব রান্নার মধ্যে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার, স্ন্যাকস তো আছেই, শেষপাতে মিষ্টিও বাদ যায়নি। বলা হয়েছে 'স্লিম অ্যান্ড হেলদি' লুকের জন্য এই বই একেবারে আদর্শ। এ বই আজকের 'ইনটেলিজেন্ট ইটিং'-এর গাইড লাইন। বুদ্ধিমান হলেই রুচিবান হওয়া যাবে।

৭

রান্না, আহার এবং রান্নার বইয়ের জটিল মানচিত্র সম্পর্কে বলতে গেলে আরও এক-ধরনের রান্নার বইয়ের কথা বলতে হবে, সেটা হল স্পেসিয়ালাইজ্‌ড্ রান্নার বই।

একদম প্রথম থেকেই এক-একটি গোত্র ধরে এই ধরনের রান্নার বই লেখা হয়েছে। প্রথম যুগে লেখা এই বইগুলি এক একটি ছোটোখাটো এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার মতো ছিল। বিপ্রদাস লিখেছিলেন, *মিষ্টান্ন পাক* (আনন্দ, [১৮৯৭] ১৯৮১) যাতে ছিল প্রায় পাঁচশো রকমের রান্না। ক্ষীর, ছানা, পাঁউরুটি, ময়দা, ডাল, চাল, ডিম, গুড়, চিনি হেন কোনো বস্তু নেই যার মিষ্টি এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। এছাড়া পিঠে-পায়েস-শরবত-সিরাপ-আইসক্রিম- কুলপি-কেক-রাবড়ি-দই সব কিছু আছে এ বইয়ে। কোন মিষ্টি কীভাবে রান্না করা হত তার রেফারেন্স বই হিসেবেও এই বই কাজে লাগবে, একে মিষ্টির এক আকর গ্রন্থ বলা যেতে পারে। একই কথা বলা যায় প্রজ্ঞাসুন্দরীর *জারক আচার ও চাটনি* (আনন্দ, [১৯২৭] ১৯৯৫) বইটি সম্পর্কেও। আচার ও চাটনি সম্পর্কে এও এক কোষগ্রন্থ। এতে আছে জারক, জলের আচার, তেলের আচার, সূর্যপক্ক আচার, কাসুন্দি, সস ও সিরকা, জ্যাম, জেলি, মোরব্বা, আমসত্ত্ব, আছে এমনকি চুরন, হজমি, টোটকা, শরবত।

কেন এই বিশাল বই? এঁদের একটি উদ্দেশ্য ছিল প্রতিটি গোত্রের মধ্যে যেসব ভ্যারাইটি আছে তার কোনোটাই যেন বাদ না যায়। বিপ্রদাস ও প্রজ্ঞাসুন্দরী যে বিশাল রান্নার বই লিখেছিলেন, এই দুটি বই ছিল তার পরিপূরক। বাঙালি আহার আমিষ হোক বা নিরামিষ হোক শেষ পাতে চাই চাটনি, আচার বা মিষ্টি। এইসব খাদ্যবস্তুর তালিকা, এই দুইজনের ক্ষেত্রেই, এত দীর্ঘ ছিল যে দুজনেই মূল বইয়ের সম্পূরক গ্রন্থ লিখতে বাধ্য হন। বৈচিত্র মানুষকে নির্বাচনের স্বাধীনতা দেয়, নিজের স্বাদ, রুচি, পছন্দের সূক্ষ্ম তারতম্য অনুযায়ী সে বেছে নিতে পারে নিজের প্রিয় খাবার। পরবর্তী সময় রেনুকা দেবী চৌধুরাণীর সংগ্রহ থেকে *রকমারি আচার* (আনন্দ, ২০১৪) এবং *রকমারি জল খাবার ও মিষ্টি* (আনন্দ, ২০১৪) প্রকাশিত হয়। তবে এই বইগুলি আগের বইগুলির মতো অত বড়ো নয়, বরং অনেক সংক্ষিপ্ত। সংক্ষিপ্ত হয়তো আজকের পাঠকের চাহিদার কথা মনে রেখে। তবে তাঁর লেখা মিষ্টির বইয়ে নানাবিধ বিস্মৃত মিষ্টির রন্ধনপ্রণালী পাওয়া যায়। যার মধ্যে রয়েছে : নাটোরের দই, রাঘবশাহি, ঢাকার পাতক্ষীর, কৃষ্ণনগরের ছানাবড়া, বহরমপুরের কালাজামের মতো কালজয়ী মিষ্টি। এছাড়া আছে ভাপা পিঠে, তাল পিঠে, পোস্তদানার মুড়কি, চুরমা বা লুচির দিলখোস বরফি প্রভৃতি। এ বই এক ধরনের এক্সোটিকার বা অচেনা বিচিত্র রান্নার সংকলন। এই ধরনের রান্না রান্নার বইয়ে অনেকটা ফ্যাশনচক্রের মতো বারবার ফিরে আসে। এ সম্পর্কে পরে আরও আলোচনা করব।

বিদেশি রান্নাও একরকম স্পেসিয়ালাইজ্‌ড্ রান্না। বাংলা রান্নার বইয়ে এই ধরনের

রান্না যে অনেকেই সংকলন করেছেন একথা আগেই বলেছি। আলাদা বই হিসেবে ছবি মুখোপাধ্যায় *বিলিতি ও ফ্রেঞ্চ রান্নার গাইড* (বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৭৫) প্রকাশিত করেন কিন্তু এই রান্নার প্রতি ততদিনে বাঙালি আগ্রহ হারিয়েছিল। এই বিষয়ে পরবর্তী সময়ে আর কোনো রান্নার বই প্রকাশিত হয়েছে বলে জানি না। বরং অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে চাইনিজ রান্না। বিপ্রদাসের বিশ্বকোষতুল্য রান্নার বইয়ে চিনা-খাবারের উল্লেখামাত্র নেই। 'চাইনিজ পলান্ন' বলে একটি পদ আছে বটে কিন্তু তার সঙ্গে চিনা রান্নার কোনো সম্পর্ক নেই। প্রজ্ঞাসুন্দরীর বিশাল বইয়েও চিন অনুপস্থিত। যেটা বলতে চাই তা হল সেই সময় বাঙালি মধ্যবিত্তের চিনে খাবার সম্পর্কে খুব একটা স্পষ্ট ধারণা ছিল না, পছন্দ করা তো দূর। এই প্রসঙ্গে দুটি ঘটনার উল্লেখ করি : সমর সেন *বাবুবৃত্তান্ত* (দে'জ, ১৯৭৮) বইয়ে লিখেছেন যে রবীন্দ্রনাথ একবার দুপুরের নিমন্ত্রণে এসেছিলেন তাঁদের বাড়িতে। 'আহারের পর সদ্য চিনফেরৎ কবিকে দীনেশচন্দ্র কথাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করেন—"চিনেরা না কি আরশোলা খায়?" কবি বিরক্ত হয়ে বলেন, "Dineshbabu, you lack a sense of perspective" (পৃ. ১২)। দ্বিতীয় গল্পটিতেও রবীন্দ্রনাথ আছেন, এই গল্পটি শুনিয়েছে সমীর দাশগুপ্ত তাঁর *সুখাদ্যের সন্ধানে* (সুবর্ণরেখা, ২০০১) বইতে। গল্পটি তাঁকে বলেছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চিনসফরকালে কোনো-এক ভোজসভায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে তাঁদের পরিবেশন করা হয়েছিল সাতবছর মাটির নীচে পুঁতে-রাখা ডিম। সমীর দাশগুপ্ত লিখছেন : 'খোলসমুক্ত ডিমগুলি নাকি বেশ গাঢ় নীল রঙের দেখতে। অতিথিদের মধ্যে নন্দলাল বসুর কী গতি হয়েছিল মনে নেই, সেন মহাশয়ের সে-রাতেই বারে বারে বমি ইত্যাদি। কোনোরকম বৈকল্য দেখা যায়নি একমাত্র বুদ্ধিমান রবীন্দ্রনাথের। তিনি ডিমকে মুহগহ্বরে চালান না-করে নাকি দাড়ির আড়ালে এবং বুকের উপরে পাতা ডিনার ন্যাপ্‌কিনের তলা দিয়ে অপূর্ব কোনো শিল্পীসুলভ কৌশলে তাঁর জোব্বার পকেটে সরিয়ে ফেলেছিলেন। ক্ষিতিমোহন সেনের কথকতাশৈলী অননুকরণীয়, যা বলতেন বিশ্বাস করিয়ে ছাড়তেন। ...আমার বালক মনে সেই গল্পের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল। যতদিন চিনে খাবার নিজে খেয়ে দেখিনি, আমার ধারণা ছিল ও-দেশের সব খাবারই বোধহয় বীভৎস ও দুর্গন্ধময়। তাছাড়া সাপখোপ টিকটিকি আরশোলা চিনেদের প্রিয় খাদ্য বরাবরই শুনে এসেছি, যার সবটাই বানানো কথা নয়' (পৃ. ৯২)।

ক্রমশ চিনে খাবার জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এর পেছনে কলকাতার চিনে রেস্তোরাঁগুলির অবদান নিশ্চয়ই আছে। চাংওয়া, ওঅল্‌ডর্ফ, পিপিং, নানকিং বা দক্ষিণের কিম-ওয়া প্রভৃতি রেস্তোরাঁ বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ছবি মুখোপাধ্যায় লেখেন

চাইনিজ রান্না ও দেশবিদেশের জলখাবার (বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৭৪)। তারপর চাইনিজ রান্না নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে, তবে এর জনপ্রিয়তার কারণ হিসেবে সাধনা মুখোপাধ্যায় তাঁর *চাইনিজ রান্না* (আনন্দ, ১৯৯১) বইতে বলেছেন, চাইনিজ রান্নার বিশিষ্ট স্বাদ এবং রন্ধনপ্রণালীর সরলতা। 'এখানে সাবেকি শিল-নোড়ার মশলা বাটাবাটি নেই, নেই রাশি রাশি পেঁয়াজ কুটতে গিয়ে চোখের নাকের জলে এক হওয়া, আর লঙ্কা বাটতে গিয়ে হাতের জ্বলুনি। রান্না করার আড়ম্বর যেমন কম, খরচও তেমনই কম' (পৃ. ৭)। স্যুপ, সস, নুডল আজকাল বাঙালি হেঁসেলেও ঢুকে পড়েছে। যে-কোনো নিমন্ত্রণে চিলি ফিস, চিলি চিকেন, চিলি পনির থাকতেই হবে। পাড়ার দোকানেও এইসব পদ পাওয়া যায়। অবশ্য এতদিনে এখানকার চিনে খাবার এক ধরনের বাঙালিত্ব অর্জন করেছে, খাবার সুস্বাদু হলে সেটা অনেকটাই স্থানীয় হেঁশেলি-প্রতিভার গুণে, খাঁটি চৈনিক রন্ধনপদ্ধতির গুণে নয়।

আরও কিছু বিশেষ গোত্রের রান্নার বইয়ের কথা বলি। বাঙালি পরিবারে শিশুদের গুরুত্ব যত বেড়েছে, শিশুদের জন্য অন্য বইয়ের মতো রান্নার বইও লেখা হয়েছে। বিপ্রদাস *পাক-প্রণালী* বইয়ে লিখেছিলেন যে বালক-বালিকাদের বাজার থেকে কিনে খাবার দেওয়া কখনোই উচিত নয়। এই খাবার বরং অনায়াসে বাড়িতে তৈরি করা যায় এবং পরিকল্পনা থাকলে এই খাবারের মধ্যে বৈচিত্রও আনা যায়। সাধনা মুখোপাধ্যায় লিখেছেন *বাচ্চাদের টিফিন* (আনন্দ, ১৯৮৮)। আজকের দিনে বাচ্চাদের টিফিনের শর্ত হল তাকে হতে হবে পুষ্টিকর, মুখরোচক এবং যেহেতু মায়েদের হাতে সময় নেই তাই চট্‌জলদি। বলেছেন বইয়ের নাম *বাচ্চাদের টিফিন* হলেও বড়োরাও টিফিনে এইসব খাবার খেতে পারেন। বলেছেন বইটি বিকেলের জলখাবারের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে। বাচ্চারা স্কুল থেকে ফিরে গরমাগরম টিফিন খাবে। প্রায় একই ধরনের বই লিখেছেন আশা মুখোপাধ্যায় *চটজলদি জলখাবার* (আনন্দ, ২০১২) নামে। অল্পসময়ে ভালো জলখাবার তৈরির বই।

মোগলাই খানা নিয়ে খুব বেশি কিছু বলবার প্রয়োজন নেই। আগেই বলেছি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দুটি রান্নার বই *পাকরাজেশ্বর:* (১৮০১) এবং *ব্যঞ্জন রত্নাকর* (১৮৫৮) মোগলাই খাবার নিয়ে লিখিত। এই খাবারের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার ব্যাপারে বেশ কিছু রেস্তোরাঁরও অবদান আছে, যেমন, চিৎপুর রোডের 'রয়্যাল ইন্ডিয়ান হোটেল', যা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২১ সালে; দ্বিতীয় প্রাচীন মোগলাই রসুইখানা 'সাবির হোটেল' প্রথমে খিদিরপুরে 'সৈদিয়া' নামে শুরু হয়। পরে সরে যায় প্রিন্সেপ স্ট্রিটে। সাবিরের রেজালা প্রসিদ্ধি অর্জন করে। এছাড়া শাহি টুকরা, চিকেন মসালা, চিকেন চাপ, শামি

বিরিয়ানি ইত্যাদি খাবার জনপ্রিয় ছিল। শোনা যায় সাবির আলি কলকাতার মানুষকে মাটন রোল উপহার দিয়েছিলেন। ১৯৩২ সালে খোলে 'নিউ আমিনিয়া হোটেল' জাকারিয়া স্ট্রিটে। এঁদের তৈরি বিরিয়ানি অসম্ভব জনপ্রিয় হয়। পরে এঁরা কর্পোরেশন অফিসের গা ঘেঁষে দ্বিতীয় শাখাটি খোলেন। সমীর দাশগুপ্ত তাঁর *সুখাদ্যের সন্ধানে* বইতে লিখেছেন : 'আমি যখন পঞ্চাশের দশকের শুরুর দিকে কলকাতায় পড়াশোনা করতে আসি, তখন আমিনিয়া ছিল কলকাতার সেরা মুসলমনি ভোজনালয়। মনে আছে, দশ আনায় খেতাম একটা তন্দুরি রুটি, এক টুকরো মাটনের কোর্মা, একটি ইরানি কাবাব এবং এক কাপ মোগলাই চা। এখানেও সেই আমলে জ্যোতি বসু খেতে আসতেন' (পৃ. ৪৩)। আধুনিককালে জবীন রেহমান লিখেছেন *মুসলিম রান্না : ঢাকা লাহোর লাখনৌ* (সুবর্ণরেখা, ১৯৯৬)। এতে আছে পোলাও, বিরিয়ানি, কোর্মা, কালিয়া, কাবাব, কোপ্তা। শুভ্রা সেন লিখেছেন *রকমারি কাবাব* (আনন্দ, ২০১১)। তিনি লিখেছেন : 'আজ প্রায় সকলের ঘরে ঘরেই রয়েছে আভেন-টোস্টার-গ্রিলার, মাইক্রোআভেন ইত্যাদি। তাই গ্রিল করা কোনও সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাবার বা বিভিন্ন রকম, বিভিন্ন স্বাদের কাবাব যে কত সহজে ও কম সময়ে ঘরেই তৈরি করে খাইয়ে লোকের মন জয় করা যায় তারই কিছু রেসিপি নিয়ে এই বইটি' (পৃ. ৭)। আরও বিস্তারিত রেসিপি নিয়ে মাইক্রোওয়েভে রান্নার প্রস্তুতপ্রণালী নিয়ে লিখেছেন রুকমা দাক্ষী *মাইক্রোআভেনে রান্না* (আনন্দ, ২০০৬)। বইটি উৎসর্গ করেছেন রান্নাঘরে বেশিসময় কাটাতে ভালোবাসেন না অথচ খেতে ও খাওয়াতে ভালোবাসেন তাঁদের জন্য। মাইক্রোওয়েভে রান্নার জন্য প্রচারিত যুক্তি ওই একই, চটজল্‌দি, স্বাস্থ্যকর, তেলবিহীন, নির্ঝঞ্ঝাট, ধোঁয়ামুক্ত এবং পরিষ্কার খাবার আধুনিক জীবনের উপযোগী।

৮

সংজ্ঞা অনুযায়ী স্ট্রিট ফুড হল সেই খাবার যা বাড়িতে যত তরিবৎ করেই রান্না করা হোক না কেন সেই স্বাদ পাওয়া যাবে না। স্ট্রিট ফুড সস্তা, সুবিধাজনক এবং মুখরোচক তো বটেই। আগেই বলেছি পুরোনো দিনে বিপ্রদাস, প্রজ্ঞাসুন্দরী প্রমুখ স্ট্রিট ফুডের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন, মূলত স্বাস্থ্যকর নয় বলে। তাঁরা সেইসব খাবার বাড়িতে তৈরি করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, রেসিপিও সরবরাহ করেন। তখনকার দিনে অবশ্য 'স্ট্রিট ফুড' কথাটা চালু ছিল না। তাঁরা রাস্তার খাবার, বাজারের খাবার বলে উল্লেখ করেছেন। ইদানীং স্ট্রিট ফুড এক অদ্ভুত কৌলীন্য অর্জন করেছে, বিভিন্ন শহরের ফুড ও রেস্তোরাঁ গাইডবুকে কোথায় কোন ভালো স্ট্রিট ফুড পাওয়া যায় তার উল্লেখ থাকে। এইসব

গাইড বুকের কল্যাণে বেশ কিছু স্ট্রিট ফুডের স্টল বিখ্যাত হয়ে গেছে। যেমন মুম্বইতে বিখ্যাত সব পাঁউভাজির দোকান আছে, দিল্লিতে আছে ছোলে ভটুরের দোকান। স্ট্রিট ফুডের ব্যতিক্রমী আস্বাদ গ্রহণ করা বর্তমান লাইফস্টাইলের অঙ্গ হয়ে গেছে। এই খাবারের শরীর-স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব এক গৌণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকে মনে করেন এ খাবার এমন সুস্বাদু যে শরীরের কথা না ভাবলেও চলবে। আমার এক বন্ধু কলকাতার স্ট্রিট ফুডের নাড়ি-নক্ষত্র জানে। তাকে একবার আমি বলি প্রতি শনিবার তোমার সঙ্গে কলকাতার স্ট্রিট ফুড আস্বাদন করতে বেরোব, তুমি তার রুট ম্যাপ্ তৈরি করে দাও। সে কিছুক্ষণের মধ্যেই এক মাসের একটা প্রোগ্রাম ছকে ফেলে, যাত্রা শুরু হবে দক্ষিণ কলকাতার অমুক গলি থেকে, সেখান থেকে ঘুগনি খেয়ে, দেড় কিলোমিটার দূরে মাংসের ছাঁটের চপ, তারপর আরও কিছু দূরে ডিমের ডালনা, আরও দু'কিলোমিটার এগিয়ে একটা অন্ধগলিতে মাছের চপ, ইত্যাদি। তারপর সে আমায় বলে 'খাবার যা খাওয়াব তা নিয়ে তোমার কোনো অভিযোগ থাকবে না। তবে মৃত্যুর জন্য তৈরি থাকতে হবে।' স্ট্রিটে ফুডের জন্য এত বড়ো বলিদান? আমার আর সাহস হয়নি।

কিন্তু স্ট্রিট ফুড সম্পর্কে রান্নার বইয়ের লেখকদের মনোভাব আজকে আর পুরোনো দিনের লেখকদের মতো নেই। রুকমা দাক্ষী তাঁর *রসনারঞ্জনে কলকাতা* (আনন্দ, ২০০৯) বইতে লিখেছেন : 'কলকাতার রাস্তার ধারের খাবার কিংবা আজকের ভাষায় জাঙ্ক ফুড নয়তো স্ট্রিট ফুড কলকাতার অন্যতম আকর্ষণ। এদিকে যেমন মুড়ি আলুর চপ, ডালের বড়া, বেগুনি নিয়ে রমরমিয়ে চলছে তেলেভাজার দোকান অন্যদিকে ফুচকাওয়ালা অথবা রোল চাউমিনওয়ালাও কিছু কম ব্যবসা করছে না। এই হল শহর কলকাতা যেখানে সব ধরনের খাবার পাওয়া যায় সবার পকেট অনুযায়ী। কিন্তু কলকাতাবাসীকে সাবাস না দিয়ে পারা যায় না। কারণ প্রকৃত অর্থে খাদ্যরসিক যারা, তারা সব ধরনের খাবারই চেখে দেখতে ভালোবাসেন' (পৃ. ১৪)। কোনো নেতিবাচক মন্তব্য নেই। সাবধানবাণী নেই। স্ট্রিট ফুড খাওয়া আজকে এক ট্রেন্ডি লাইফস্টাইলের অঙ্গ। সেই জন্য আজকের ছেলে-ছোকরাদের স্টাইল মেরে ফুচকা খেতে দেখা যায়।

রুকমা তাঁর বইতে 'স্ট্রিট ফুড' বলে একটি অধ্যায়ও রেখেছেন এবং সেখানে আলুর চপ, বেগুনি, কিমা কাটলেট, মাছের চপ, ডিমের ডেভিল ইত্যাদি পদগুলি রয়েছে। বলে রাখা ভালো এইসব পদগুলি প্রায় সব রান্নার বইতেই থাকে, কিন্তু সেখানে এগুলি জলখাবার বা স্ন্যাক্স বলে উল্লিখিত হয়। আগেই বলেছি স্ট্রিট ফুড রান্নার রেসিপি অনেকটা সোনার পাথরবাটির মতো। এক-একটি জায়গার এক-এক রকমের স্ট্রিট ফুডের খ্যাতি ছড়ায়, কিন্তু এইসব খাবারের স্বাদের রহস্যভেদ করা যায় না, বা রেপ্লিকেট

করা যায় না। বাড়িতে স্ট্রিট ফুড তৈরি করা অনেকটা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার মতো। বাড়িতে তৈরি করা যায় না বলেই স্ট্রিট ফুডের আকর্ষণ।

তবে স্ট্রিট ফুডের প্রকৃত সমঝদার শুধু আজকের দিনের মানুষ, তারাই একে কৌলীন্য দিয়েছে এরকম ভাবলে কিন্তু ভুল হবে। গোপাল হালদার তাঁর *আড্ডা* বইতে লিখেছেন হিরণকুমার সান্যাল তাঁর রক্তের চাপের জন্য বাড়িতে মাংসাহার বর্জন করে প্রায়শই যেতেন পটুয়াটোলার মোড়ের কাছে হ্যারিসন রোডের ফুটপাথের উপর এক প্রাচীন হিন্দুস্থানি কচুরির দোকানে। ওই দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে হিরণকুমার লেখককে এইরকম বলেছিলেন : 'ঐ যে সামনে চারতলা বাড়ি দেখছেন ওটা ছিল আমার স্কুলবাড়ি। ওরই একটি ঘর থেকে ক্লাসে বসে বসে লক্ষ করতাম বিশুদ্ধ হিঙের কচুরির পাকপ্রক্রিয়া। কলকাতা শহরে কত নব্য ভোজনালয়ের উত্থানপতন ঘটল, কিন্তু দেহাতি দোকানটি আজও রয়েছে অবিচলিত। এতে বোঝা যায় এই পরিবর্তনশীল সমাজে ঐতিহ্যের সমাদর এখনও লোপ পায়নি। আর এই ঐতিহ্যের ধারক কারা জানেন? আমার মামার বাড়ি, ঐ ঠিক বেনেটোলার মোড়ে। ডাক্তারি শাস্ত্রমতে কচুরি আমার পক্ষে নিষিদ্ধ। আমার দুই-দুই মামা ডাক্তার হলেও মামার বাড়িতে এই দোকানের কচুরি হল চায়ের সঙ্গে আমার বরাদ্দ। কেননা ভালো ডাক্তার কিনা, তাই তাঁরা বোঝেন দেহ ও মনের সামঞ্জস্যবিধানের মাঝে মাঝে চিকিৎসাসূত্রের লঙ্ঘন অনিবার্য। অতএব এই কচুরি আপনাকে খানদুয়েক খেতেই হবে। আর তার সঙ্গে অনুপান পাবেন যে আলুর তরকারি তার তুলনা ভূভারতে কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। দেখুন এই হিন্দুস্থানি কচুরি খাই বলে সংকীর্ণচেতা লোকেরা বলবে আমি বাংলা-বিহার-মার্জারের পক্ষপাতী। কিন্তু আপনি বুঝবেন আমার আদর্শ হল, আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা' (পৃ. ৬৯-৭০)।

তাহলে স্ট্রিট ফুড-সম্পর্কিত যাবতীয় সাবধানবাণীর এই হল উত্তর।

৯

বেশ কিছু বছর আগে অর্জুন আপ্পাদুরাই ভারতে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত আধুনিক রান্নার বই নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন ('হাউ টু মেক এ ন্যাশনাল কুইজিন : কুক বুক্স ইন কনটেম্পোরারি ইন্ডিয়া', *কমপ্যারেটিভ স্টাডিজ ইন সোসাইটি অ্যান্ড হিস্টরি*, ৩০(১), ১৯৮৮, পৃ. ৩-২৩)। অর্জুন এই প্রবন্ধে দেখান কীভাবে ইংরেজিতে লেখা রান্নার বইগুলি ভারতের আঞ্চলিক রান্না সংকলিত করে এক জাতীয় কুইজিন নির্মাণ করছে। তিনি বলেছেন আঞ্চলিক রান্না নির্বাচনের প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা ওপর-পড়া ভাব আছে, অনাহূতভাবে ঢুকে পড়া যেন। আঞ্চলিক ইডিয়মের প্রতিনিধিত্ব যে কয়েকটি

'বিশিষ্ট' পদ করে, অঞ্চলের ভিতরকার মানুষ সেগুলিকে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হিসেবে মনে করেন না, এই ভূমিকার জন্য পদগুলি যোগ্য বলেও মনে করেন না। বিভিন্ন লোকাল ও আঞ্চলিক ঐতিহ্যের এই পারস্পরিক স্বীকৃতির জন্য গুঁতোগুঁতিতে, কিছু আঞ্চলিক ঐতিহ্য, যাদের শহুরে যোগাযোগ, প্রতিষ্ঠানিক ক্ষমতা এবং বিভিন্ন সাংবাদমাধ্যমে ইত্যাদির জোর আছে, তারা তুলনামূলকভাবে দীনহীন, অকিঞ্চিৎকর অঞ্চলকে এই কসমোপলিটান চিত্র থেকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। যেমন তেলেগু কুইজিন ক্রমশই তামিল কুইজিন দ্বারা অপসারিত হচ্ছে, ওড়িয়া রান্নাকে সরিয়ে দিচ্ছে বাঙালি রান্না, কন্নড়, মারাঠি, রাজস্থানি রান্নার বদলে দেখা যাচ্ছে গুজরাটি রান্না। তিনি বলেছেন তথাকথিত দুর্বল আঞ্চলিক ঐতিহ্যগুলির যে নিজস্ব রান্নার বই নেই তা নয় কিন্তু তারা নতুন জাতীয় মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক মানচিত্রে স্থান পাবার লড়াইয়ে ক্রমশ হেরে যাচ্ছে।

বাংলা রান্নার বইয়ে ওই একই চিত্রের প্রতিফলন দেখতে পাই। এ যেন বাংলা ভাষায় লেখা জাতীয় কুইজিন। এখানেও বিশেষ কিছু অঞ্চলই স্থান পায়, আর কিছু অঞ্চল সব সময় বাদ যায়। রুকমা দাক্ষীর *রসনারঞ্জনে কলকাতা* বইয়ে আছে গুজরাতি, রাজস্থানি, মহারাষ্ট্রীয়, পাঞ্জাবি, বাঙালি আর 'দক্ষিণ ভারতীয়' রান্না। এই 'দক্ষিণ ভারতীয় রান্না' জাতীয় কুইজিনের লেখকদের ক্যাটাগরি। এখানে তামিল, তেলেগু, কন্নড়, মালোয়ালি কুইজিনের পার্থক্যকে ভেঙে ফেলা হয়। বাংলা ভাষায় আলাদা করে পাঞ্জাবি রান্না, তামিল রান্না বা গুজরাতি রান্নার বই নেই। এইসব আঞ্চলিক রান্নার কয়েকটি পদ শুধু স্থান পেয়েছে এই ধরনের জাতীয় কুইজিনের বইয়ে। সেইগুলিও এই অঞ্চলের প্রতিনিধিমূলক রান্না নয়। সাধনা মুখোপাধ্যায়ের *রান্না করে দেখুন* (আনন্দ, ১৯৭৭) বইতেও একটি অধ্যায়ে আছে 'দক্ষিণ ভারতীয় কয়েকটি পদ'। এখানে তিনি লিখেছেন 'দক্ষিণ ভারতীয় রান্না ইডলি, ধোসা, সম্বর আজকাল খুবই জনপ্রিয়। এগুলি কিন্তু বাড়িতেও তৈরি করা যায়। দক্ষিণ ভারতীয় পদগুলির স্বাদ সত্যিই অনন্য—অন্য কোনও ভারতীয় রান্নার স্বাদ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।' লক্ষ করুন তামিল, তেলেগু, কন্নড়, মালয়ালম কুইজিনের আলাদা আলাদা ট্রাডিশন, পার্থক্য, স্বাদ, এখানে কিন্তু ভেঙে ফেলা হল।

শতরূপা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী : ভারতীয় আমিষ রান্না* (আনন্দ, ২৯১১) বইতে বরং অনেক বেশি খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়েছেন, আঞ্চলিক বিস্তারও তাঁর বইয়ে অনেক বেশি। যেমন তাঁর বইয়ে আছে কোঙ্কণি রান্না, মালাবার উপকূলের রান্না, চেট্টিনাড়, রায়ালসীমা, মাদুরাই, অওধি প্রভৃতি অঞ্চলের রান্না। তিনি আবার একই সঙ্গে বিভিন্ন অল্পসংখ্যক গোষ্ঠীর রান্নাও দিয়েছেন, যেমন : পারসি, বোহ্‌রি মুসলিম, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, খোজা, মালাবার মুসলিম, সিন্ধি প্রভৃতি। প্রশ্ন হল

এত বিভিন্ন, বৈচিত্র্যময়, বহুবিধ, নানা কিসিমের রান্নাকে জাতীয় কুইজিনের কাঠামোয় সংঘটিত করা যায় কীভাবে? অর্জুন বলেছেন অনেকে এই থিমটি খুঁজে পান মশলা ও মশলার কম্বিনেশনে। কিন্তু এখানেও আঞ্চলিক পার্থক্য এত বেশি, যে সর্বজনীনের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। অনেকে প্রক্রিয়ার উপর জোর দেন। যেমন রোস্ট করা, ফ্রাই করা, এবং প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে ভারতীয় রান্নাকে একসূত্রে বাঁধবার চেষ্টা করেন। অনেকে আবার একটা বিশেষ গোত্রের আহার বেছে নিয়েছেন, যেমন আচার, এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আচারের প্রস্তুতপ্রণালী দিয়েছেন। বাঙালি রান্নার বইয়ে লেখকরা কিছুটা প্রত্যক্ষজনিত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আঞ্চলিক রান্নাগুলি বেছে নিয়েছেন এবং সংকলিত করেছেন।

কিন্তু এই সংকলনের পেছনে ভারতীয় আহার-সম্পর্কিত কিছু অনুমান কাজ করে বা আরও স্পষ্ট করে বললে ভারতীয় আহারের স্ট্রাকচার সম্বন্ধীয় অনুমান। অনেকে বইয়ের অধ্যায়গুলি ভাগও করেন সেভাবে। আগেই বলেছি এই স্ট্রাকচার হল , ভাত-পুরি-পরটা, ডাল, নিরামিষ সবজি, মাছ-মাংস-ডিম, চাটনি, মিষ্টি। এইবার আঞ্চলিক রান্নাগুলি মানানসই গোত্রের অধীনে নিয়ে আসা হয়। শতরূপার বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারতীয় রান্নার বইটি যদিও শুধুমাত্র আমিষ রান্নার সংকলন, তবুও তিনি এই বহুবিধ রান্নাকে সাজিয়েছেন এইভাবে : রুটি-লুচি-পরোটা, ভাত, মাছ, চিকেন, মাংস, ডিম, ইত্যাদি। আগেই আলোচনা করেছি এর পেছনে মেনুর একটা ধারণা কাজ করে। এই সংগঠন প্রতিফলিত করে এক স্বাভাবিক (অর্থাৎ সাংস্কৃতিক) আহার, যেখানে প্রস্তুত পদগুলি সাজানো হয়েছে মূল উপাদানের ভিত্তিতে, যেমন, দানাশস্য (চাল, গম), ডাল, তরিতরকারি ইত্যাদি। অর্জুন বলছেন অনেক সময়ে এই স্ট্রাকচার আঞ্চলিক পদের অদ্ভুত সমাবেশ ঘটিয়ে দেয়। তামিল দোসা এবং পাঞ্জাবি চাপাটি, 'রুটি'র অধীনে সহাবস্থান করে, যদিও প্রথমটি হল স্ন্যাক এবং দ্বিতীয়টি হল মিল-আইটেম। অন্যভাবে আমরা বলতে পারি এই বইগুলি এক সর্বভারতীয় রন্ধনের ইডিয়মের খোঁজ করে, যার মাধ্যমে ক্রমপ্রসারিত আঞ্চলিক খাবারের জগৎকে সংগঠিত করা যায়। ভারতীয় কুইজিনের এই ধারণা, সত্যি বলতে কি, উন্মেষিত হয়েছে যত আঞ্চলিক রান্নাগুলি প্রাধান্য অর্জন করেছে।

১০

রান্নার বই এক জটিল সংস্কৃতির গল্প বলে, গল্প বলে সমাজ, নৈতিকতা, শ্রেণিবিভাজন, রুচির। খাদ্যরুচির ক্ষেত্রে কী ঠিক, কী বেঠিক, কোনটা উচিত, কোনটা অনুচিত সেটা

ঠিক করে দেয় এই রান্নার বই। যদিও ঠিক-বেঠিক, উচিত-অনুচিতের সীমানা সব সময়ই পরিবর্তনশীল। বস্তুত রান্নার বই নির্মীয়মাণ সংস্কৃতির এক সাধন। বাঙালি খাদ্যরুচির ডিসকোর্স তৈরি হয়েছে এই রান্নার বইগুলির মাধ্যমেই। আগেই বলেছি বাঙালি রান্না ও আহারের জগতে মেনুর অনুপ্রবেশ বাংলা রান্নার বইয়ের মাধ্যমেই, বিভিন্ন পর্যায়ে সেই মেনু কী রূপ নিয়েছে তার একটা পরিচয়ও দেবার চেষ্টা করেছি এই লেখায়। মেনুর সঙ্গে রুচির এক গভীর সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্ক অনেক সময় নির্ভর করে পদের সামঞ্জস্য বিধানের উপর। কোন পদের সঙ্গে কী যাবে। সমীর দাশগুপ্ত তাঁর *সুখাদ্যের সন্ধানে* বইতে লিখেছেন : 'কাঁকড়ার ঝালের সঙ্গে ঘি-ভাত বা পোলাও চলবে। বড়ো জোর ঘি ছাড়া কড়াইশুঁটি ভাত অথবা জিরে ভাত পরিবেশন করতে পারেন। আবার মাছের নানারকম পদের আগে কোন্ ডাল খাবেন সেটা ভেবে নিলে ভালো। ডাল আদৌ খাবেন কিনা সেটাও বিরাট প্রশ্ন। কখনো-কখনো আসল পদের আগে ভাজা খাওয়া বেমানান। কখনো বেগুনভাজা না রেখে মেনুতে কুমড়ো ভাজা কিংবা বকফুল ভাজা কিংবা কাঁকরোলের পুরভাজা রাখলে ভালো লাগবে। আবার স্থানবিশেষে শুধু একটু করলাভাজা চমৎকার ক্ষুধা উদ্রেককর হিসেবে কাজ করতে পারে। আরেকটা কথা। কোথায় দু-রকমের মাছের ব্যঞ্জন থাকবে, আর কখন একটা মাছের ডিশের পরে মুরগির কোনও মানানসই পদ অথবা পাঁঠার ঝোল চলবে, সেটা নির্ভর করবে মেনু-রচয়িতার মেধার ওপর। ভোজটা কেমন উৎরাবে সেটা যতটা নির্ভরশীল গুণী পাচকের ওপর, ততটাই মেনু-কর্তার সূক্ষ্ম রুচি ও বোধের ওপর। তবে উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা ফিজিকালের চেয়ে ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল বেশি। বোধ, রুচি, কুশলতা ব্যাপারগুলি, শেষ বিশ্লেষণে, মস্তিষ্কের এলাকার বস্তু। যার সেটা নেই, সে উঁচুদরের ভোজের আসরের দায়িত্ব নিতে অপারগ' (পৃ. ৩৬)। মানুষের পছন্দকে নিয়েই তার রুচি, কিন্তু এই পছন্দ সবসময় তার মস্তিষ্কপ্রসূত নয়, এই পছন্দ নির্মিত হয়। অন্যভাবে আমরা বলতে পারি ভোগ্যবস্তু যেমন উৎপাদিত হয়, তেমনি রুচিও উৎপাদিত হয় এবং দুইয়ের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কিন্তু এ হল এক সাধারণ উক্তি। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, এবং আমাদের আলোচ্য খাদ্যরুচির ক্ষেত্রে, তা কীভাবে বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করে, কীভাবে সূক্ষ্ম পার্থক্য রুচি এবং রুচিহীনের সীমানা নির্দেশ করে, সেটাই অনুসন্ধানের বস্তু।

পরিবর্তনশীল খাদ্যরুচির অবয়ব যে পালটাতে থাকবে সেটা অন্যদের ক্ষেত্রে যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি বাঙালিদের ক্ষেত্রেও। বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন বাঙালি রান্না কালগ্রস্ত, একটি কলাবিদ্যা যা আমরা হারিয়ে ফেলেছি, আজকে আর সেইসব সূক্ষ্ম

জটিল কারুকর্মের জন্য সময় নেই (*ভোজনশিল্পী বাঙালি*, (বিকল্প, ২০০৪)। কিন্তু রন্ধনশিল্পে কোনো কিছুই শেষ অবধি সম্পূর্ণ হারিয়ে যায় না, ফিরে আসে, হয়তো অন্যভাবে অন্য সম্পর্কের সূত্র ধরে। রান্না-আহার সে অর্থে ফ্যাশনের মতো, এর সম্মুখগতি একরৈখিক নয় বরং এটি আবর্তিত হয় বৃত্তাকারে। তাই আজ দেখি পুরোনো রান্না আবার ফিরে এসেছে, কিন্তু একটু অন্যভাবে। এক ধরনের ক্লাসিকাল রুচির পরিচায়ক হিসেবে। কাঁথা যেমন একসময় দৈনন্দিন ব্যবহারর বস্তু ছিল, আজকে তা শিল্পবস্তু। সাধনা মুখোপাধ্যায় লিখেছেন *পুরোনো কলকাতার রান্নাবান্না* (আনন্দ, ১৯৯০), যাতে আছে মোচার আমযোল, কাঁচকলার হিঙ্গির মতো রান্না, রয়েছে তিরিশ রকমের পায়েস। শতরূপা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন *আমার ঠাকুমা-দিদিমার রান্না* (আনন্দ, ২০০২) যাতে আছে আঙুরের রসে রসগোল্লার চাটনি, বা ক্ষীরের মোহনভোগের মতো রান্না। অবশ্য দুজনেই সেকালের নিত্যকার শুক্ত, ডাল, ঘণ্ট, ছেঁচকি, চচ্চড়ি, ডালনা, ধোঁকা, কালিয়া, চাটনির কথাও লিখেছেন। কুসুমকলি দেবীর *রান্নাঘর* (আনন্দ, ২০০৫) প্রকাশিত হয়েছে। এতে আছে কমলালেবুর পোলাও, দইয়ের কাবাব, খরমুজের খোসার কারি, কুঁচো চিংড়ির ফুলুরি, প্রভৃতি রান্না। বিজয়া চৌধুরীর *রান্নাঘরের সাতকাহন* (আনন্দ, ২০০৯) বইটিও পুরোনো ঘরানার রান্নার। পূর্ণিমা ঠাকুর লিখেছেন *ঠাকুরবাড়ির রান্না* (আনন্দ, ১৯৮৬), বইয়ের নামেই যার পরিচয়। তবে হ্যাঁ, সকলেই রেসিপি দিয়েছেন আধুনিক যুগের উপযোগী করে। শতরূপা লিখেছেন : 'ঠাকুমা-দিদিমা-র অনেক রান্নাই আমি আধুনিক কালের উপযোগী করে নিয়েছি। তাঁরা প্রেসার কুকার ব্যবহার করতেন না। রাঁধতেন উনুনে কয়লার আঁচে এবং পেতল-কাঁসা, লোহার বাসনে। এ কথা ঠিকই যে এই সব বাসনে রান্নার স্বাদই আলাদা। আমি প্রেসার কুকার, গ্যাস ও নন-স্টিক বাসনের কথা লিখেছি। কারণ আজকের দিনে এগুলি ছাড়া চলে না। তাছাড়া ঠাকুরমারা ভালো ঘি, গরমমশলা, বাদাম পেস্তা, জাফরানের ব্যবহার করতেন প্রচুর। এখন স্বাস্থ্যের কারণে ভাল ঘি মাখনের ব্যবহার খুবই কমে গেছে। তারই সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রান্নার সামান্য অদল-বদল করেছি যাতে ওই রান্নাগুলি আমাদের রান্নাঘর সহজেই করা যায়' (পৃ. ১০)। আজকে পুরোনো রান্না ব্যবহৃত হয় ভোজের নভেল আইটেম হিসেবে, শখের রান্নার পদ হিসেবে বা রুচি-কৌলীন্যের পরিচায়ক হিসেবে। পুরোনো রান্নার কনটেক্সট বদলে গেছে। কে বলতে পারে হয়তো আজকের দিনে বর্তমান যুগের উপযোগী করে *পাকরাজেশ্বর:* বা *ব্যঞ্জন রত্নাকর:* আবার প্রকাশিত হবে না।

সবশেষে বলি বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় এবং বৈষ্ণবচরণ বসাক (*সৌখিন পাকপ্রণালী*, সি সি বসাক অ্যান্ড সন্স, ১৯১৬) এই দুইজনের পর বাংলা রান্নার বই সম্পূর্ণভাবে

মেয়েদের দখলে চলে যায়। মেয়েরা এই বিশেষ সাহিত্যের ওপর একচেটিয়া অধিকার কায়েম করে ফেলেন। যাদের কথা উল্লেখ করেছি তাঁরা ছাড়া পুরোনো দিনে ছিলেন—সুলেখা সরকার (*রান্নার বই*, এম সি সরকার, ১৯৭০), বীণাপাণি দেবী (*ছেলেদের টিফিন*, দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং, ১৯৫২), বীণাপাণি মিত্র (*রন্ধন সংকেত*, শরৎকুমার মিত্র, ১৯৫৫), বেলা দে (*রান্নাবান্না*, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েট পাবলিশার্স, ১৯৬০), সুষমা সরকার (*রন্ধন শিক্ষা*, দেব সাহিত্য কুটির, ১৯৫৭) তনুজা দেবী (*পাঁচমিশালি*, ১৯৪৯) প্রভৃতি আরও অনেকে। মেয়েরা এই একচেটিয়া অধিকার আদায় করে নেন তাঁদের পরিশ্রম, কমিটমেন্ট এবং লেখার গুণে। রান্নার বই মূলত ব্যবহারিক, এটা একটা প্রায়োগিক বিদ্যা। পাঠককে হাতে-কলমে রান্নাটি করতে প্রথম থেকে শেষ ধাপ অবধি সাহায্য করতে হবে। এই কাজটি বাঙালি মেয়েরা ঠিকমতো করেছেন বলেই স্বীকৃতি পেয়েছেন। গত একশো বছরে বাঙালি নারীর মানমর্যাদা কতটা বৃদ্ধি হয়েছে সেটা অনুসন্ধানের বিষয়, কিন্তু এই একটি জগতে তাঁরা সম্রাজ্ঞী। ফলে রসনার রুচিনির্মাণের ক্ষেত্রে বাঙালি মেয়েরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সকলেই স্বীকার করবেন রুচিনির্মাণের এই যে ক্ষেত্র, গুরুত্ব বা ব্যাপ্তি কোনো দিক থেকেই তা অবহেলার নয়। অবশ্যই বাঙালি নারীরা এক হাতে এই রুচিনির্মাণ করছেন, এরকম ভাবলে ভুল হবে। এর সঙ্গে যুক্ত আছে বাজার, পুঁজি, প্রযুক্তি, সংবাদমাধ্যম প্রভৃতি। একথা সাধারণভাবে যে-কোনো সাংস্কৃতিক প্রোডাক্টের ক্ষেত্রেই সত্য। কিন্তু তা বলে এইসব শক্তি রুচি নির্মাণকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে তাও নয়। রান্নার বই লেখা সেরকমই এক ক্ষেত্র, এবং এই ক্ষেত্রে বাঙালি মেয়েরা তাঁদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন, এটাই সবচেয়ে বড়ো কথা।